

১ জানুয়ারি প্রজ্ঞা জালালিতে অংশ নিন

প্রজ্ঞাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। জ্ঞানের সাথে অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির মেলবন্ধন ঘটাতে পারলেই পরিণত হওয়া সম্ভব প্রজ্ঞাবান মানুষে। এজন্যে চাই প্রস্তুতি এবং সজ্জবদ্ধ প্রয়াস।

গুরুজীর পরিচালনায় ১ জানুয়ারি ২০২০ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বছরের প্রথম প্রজ্ঞা জালালি। ঢাকার কাকরাইলে আইডিইবি ভবনে দিনব্যাপী এ আয়োজনে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার সকলেই আমন্ত্রিত।

বর্ষায়ন ২০২০

৩ জানুয়ারি শুক্রবার

সপরিবারে আসুন

কোয়ান্টাম মেথড ২০২০-এ শুরু করতে যাচ্ছে ২৮ তম বছরের শুভযাত্রা। এ উপলক্ষে ৩ জানুয়ারি শুক্রবার সকল সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলের উদ্যোগে উদযাপন করা হবে কোয়ান্টাম বর্ষায়ন।

বছরের প্রথম শুক্রবার দেশজুড়ে বিভিন্ন স্থানে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা সপরিবারে একত্রিত হবেন নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে।

নতুন সংস্করণে কোয়ান্টাম কণিকা বই



প্রকাশিত হয়েছে
‘আলোকিত
জীবনের হাজার
সূত্র II কোয়ান্টাম
কণিকা’ বইটির
পরিমার্জিত
সংস্করণ।
সাধকদের
চিরায়ত জ্ঞানের
নির্যাসের সাথে
আধুনিক

বিজ্ঞানের সমন্বয়ে রচিত হয়েছে কোয়ান্টাম কণিকাগুলো। জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় ছোট ছোট সাফল্যসূত্র স্থান পেয়েছে বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে। সময়কাল অনুসারে বিন্যস্ত করা হয়েছে পবিত্র ধর্মবাহীগুলোকে। প্রতিটি মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে এ বইটি হতে পারে অন্যতম সহায়ক পাঠ্য।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রসহ আপনার নিকটস্থ সেন্টার শাখা সেল থেকে বইটি আজই সংগ্রহ করুন।



নতুন শুরুর বছর ২০২০

২০২০-এ যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের নতুন ক্যাম্পাস-সবুজায়ন। বান্দরবান লামার কোয়ান্টামমে সহস্রাবধি দুষ্-বঞ্চিত শিশুর শিক্ষাকেন্দ্র ও আবাসস্থল হয়ে উঠতে যাচ্ছে সদ্যনির্মিত এই সুপারিসর ক্যাম্পাসটি। ফাউন্ডেশনের সাথে একাত্মতার বরকতে আপনার জীবনেও আগামী বছরটিতে আসতে পারে নতুন সুযোগ। পরম করুণাময়ের অশেষ রহমতে সূচিত হতে পারে সাফল্য ও সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। ২০২০ হয়ে উঠুক আপনার নতুন শুরুর বছর।

২০০১ সালে লামার কোয়ান্টামমে অত্যন্ত সীমিত

পরিসরে যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল। শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল সাত জন! গত দেড় যুগে ধাপে ধাপে বিস্তৃত ও বিকশিত হয়ে ইতোমধ্যে তা রূপ নিয়েছে দেশসেরা একটি অনন্য বিদ্যায়তনে। আধুনিক শিক্ষা, নানা ধরনের

সহশিক্ষা কার্যক্রম ও বিভিন্ন সুকুমার বৃত্তির চর্চা এবং একটি অনন্য নৈতিক আবহে এখানে বেড়ে উঠছে ২২ শতাধিক ছেলে ও মেয়ে শিশু।

যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ফলে এই শিশুরাই নিয়মিত ভিত্তিতে অর্জন করছে দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বহুমুখী সাফল্য। প্রতিবছর ভর্তি পরীক্ষায় মেধাতালিকায় জায়গা করে নিচ্ছে সরকারি মেডিকেল ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে।

সূচনালগ্ন থেকেই সৃষ্টির সেবার লক্ষ্য নিয়ে অপ্রচলিত এক পথ বেছে নিয়েছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, যা

এদেশে এক বিরল দৃষ্টান্ত। তা হলো, স্ব-উদ্যোগ স্ব-পরিকল্পনা ও স্ব-অর্থায়নে প্রতিটি সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা। এই অনিশ্চিত যাত্রায় নানা সময়ে প্রতিকূলতা এসেছে অনেক, কিন্তু কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সদস্যরা সবসময় বিশ্বাসে অটল থেকেছেন। সজ্জবদ্ধভাবে তারা কাজ করে গেছেন নিরলস। সেবাকর্মে অংশ নিয়েছেন অর্থ, সময় ও শ্রম দিয়ে। নিজেরা যেমন দান করেছেন নিয়মিত, তেমনি চারপাশের মানুষকেও উদ্বুদ্ধ করেছেন নিঃস্বার্থ দানে।

এই ধারাবাহিকতায় বলা যায়, কোয়ান্টাম আজ ‘নিজের জীবন নিজে গড়ার’ এক সার্থক দৃষ্টান্ত। শূন্য থেকে শুরু করে এই সংসজ্জ যেমন ক্রমাগত এগিয়ে গেছে, একইভাবে এর সহযাত্রীদের জীবনেও এসেছে নানা ইতিবাচক পরিবর্তন ও বহুমুখী অর্জন। সেইসাথে সবাই মিলে সম্ভব হচ্ছে একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনের স্বপ্ন

দেখা এবং আত্মকেন্দ্রিকতার দেয়াল ভেঙে সে লক্ষ্যে সক্রিয় অবদান রাখা।

আসন্ন বছরে সজ্জবদ্ধ সেবা উদ্যোগের এমনই এক উদাহরণ হতে যাচ্ছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের এই নতুন ক্যাম্পাস ‘সবুজায়ন’-এর উদ্বোধন। যে-কোনো লক্ষ্যাভিসারী মানুষের জন্যেই যা হবে এক অনুপ্রেরণার উৎস।

তাই কোয়ান্টামের সাথে থাকুন। সঙ্গী হোন ইতিবাচকতা, সেবা, মানবিকতা ও সাফল্যের। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সূচনা হোক সার্থকতার এক নতুন অভিযাত্রা।

বঞ্চিতের শীত নিবারণে সাধ্যমতো দান করুন

বঞ্চিত মানুষের শীত নিবারণে দান সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। এই আহ্বানে ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছেন কোয়ান্টাম পরিবারের সর্বস্তরের সদস্যরা। নিজেরা সাধ্যমতো দান করছেন এবং এই আবেদন পৌঁছে দিচ্ছেন আত্মীয়-বন্ধু-প্রতিবেশী ও পরিচিতদের কাছে।

দেশের পার্বত্য ও উত্তরাঞ্চলে তীব্র শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচতে সাধারণত প্রয়োজন পুরু কম্বল, সোয়েটার, ভারী জ্যাকেট, কানটুপি, হাত মোজা, পা মোজা ও মাফলার। এজন্যে জনপ্রতি ব্যয় হয় ন্যূনতম ৫০০০ টাকা।

তাই অসহায়-বঞ্চিত শিশুসহ সব বয়সী মানুষের জন্যে আর্থিক দান সংগ্রহ করছে কোয়ান্টাম সদস্যরা। আগামী কয়েক বছর যেন নির্বিল্পে ব্যবহার করা যায়, তেমন উন্নত মানের কাপড় কেনার লক্ষ্যেই এ আয়োজন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা উপার্জন করো আর জমিন থেকে যা উৎপাদিত হয়, তা থেকে ভালো অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করো। বেছে বেছে খারাপ জিনিসগুলো দান করতে যেও না। ...’ (সূরা বাকারা : ২৬৭)

শীতবস্ত্র কেনার সামর্থ্য নেই, দেশের এমন সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষকে শীত নিবারণের যাবতীয় উপকরণ পৌঁছে দেয়াই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সাম্প্রতিক এ উদ্যোগের লক্ষ্য।

অর্থাৎ দানের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত-শুধু অর্থ নয়, দাতার অন্তরের উষ্ণতা এবং মমতা যেন দানের সাথে থাকে। এটাই আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়। তাই বঞ্চিতের শীত নিবারণে সাধ্যমতো দান করুন। দেশের অসহায় জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিজে দান করার পাশাপাশি দানে উদ্বুদ্ধ করুন পরিচিতদেরও।

কোয়ান্টাম মেথড

৪৬৫ তম কোর্স

১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

৪৬৬ তম কোর্স

১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ জানুয়ারি
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স
বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। ১১ মার্চ ২০১৯ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
আয়োজিত মুক্ত আলোচনার ৮৫ তম পর্বে তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন।
নিম্নোক্ত নিবন্ধটি তার আলোচনার নির্বাচিত অংশের অনুলিখন।

অনেক দূর যেতে হবে আমাদের

সেলিনা হোসেন



১৯৭০ সাল। সে-বছরই আমার পেশাজীবনের শুরু। আমি যোগ দিলাম বাংলা একাডেমিতে। তারপর যুদ্ধের সেই নয় মাস। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বহু কিছু জানার সুযোগ আমার হয়েছিল।

পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হলো ১৯৭০ সালে। বঙ্গবন্ধু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়ী হলেন। আমাদের সামনে বাঙালি জাতিসত্তার একটি বড় দরজা খুলে গেল। ভেবেছিলাম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়নে বাঙালিরা ২৪ বছর যে দুর্বিষহ জীবন কাটিয়েছে, তা থেকে এবার আমাদের পরিত্রাণ হবে। কিন্তু সেটা হয় নি। সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান এবং রাজনৈতিক নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো তা হতে দেয় নি। তাই স্বাধীনতার মতো একটি জাতিত্ব স্বপ্ন আমাদের সামনে তখন বাঙময় হয়ে ওঠে।

এখনো মনে আছে—১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনার রেসকোর্সে গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ শুনতে। মেয়েদের জন্যে ঘেরাও করা একটি জায়গা ছিল, আমি সেখানে বসেছিলাম। আমার সামনে ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল। আরেক পাশে বাঁশ দিয়ে ঘেরাও করা জায়গাটিতে ছিলেন বরেন্দ্র দাশনিক ও শিক্ষাবিদ সরদার ফজলুল করিম।

ভাষণ শেষে তার সাথে দেখা হলো। তিনি আমাকে বললেন, ‘মনে হচ্ছিল, আমার মাথা আকাশ সমান লম্বা হয়ে যাচ্ছে এবং আমি একজন বিশাল মানুষ হয়ে যাচ্ছি। পাকিস্তানি হেলিকপ্টার যখন মাঠের দিকে উড়ে আসছিল তখন আমার একটুও ভয় হয় নি। একবারও ভাবি নি আমাকে এখান থেকে পালাতে হবে।’

ভিড় কমার পর আমি বের হলাম। বাংলা একাডেমির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় একজন বাদামওয়ালা মুখে শুনলাম—‘মুইছ্যা গেছে! পূর্ব পাকিস্তান মুইছ্যা গেছে!’ বিস্ময় নিয়ে তার মুখের দিকে সেদিন তাকিয়ে ছিলাম।

তারপর ২৫ মার্চ। সংঘটিত হলো ইতিহাসের বর্বরোচিত হত্যাজ্ঞা। মধ্যরাতেও গোলাগুলির আওয়াজ শুনছি। মানুষের আত্মত্বকার শুনছি। ২৭ মার্চ কারফিউ শেষ হলো। আমি বাড়ির বাইরে বের হলাম। লিখতে হলে আমাকে তো বাস্তব চিত্রটা দেখতে হবে। এই অভ্যাস আমার এখনো আছে। কোনো জায়গা না দেখে আমি লিখতে পারি না।

তখন আমি এলিফ্যান্ট রোডে থাকতাম। নিউ মার্কেটের দিকে এগোচ্ছি। রাস্তার দুপাশে লাশ পড়ে আছে। তরকারির ঝুড়িতে উপুড় হয়ে আছে অনেক মানুষের নিখর দেহ। তাদের পিঠে দেখা যাচ্ছে গুলির ক্ষত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে গেলাম, বর্তমানে যেটি শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল। ৪০৩ নম্বর রুমের মাঝখানে রক্ত জমাট হয়ে আছে। লাশ টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন। সিঁড়ি আর বারান্দাও রক্তাক্ত। ছাদে গেলাম। দেখি পানির ট্যাংকের পাশে গুলিবিদ্ধ একজনের লাশ। তার দুই হাত দুদিকে প্রসারিত। তার ওপর দুটো ছেলে-মেয়ে পড়ে আছে। সাত-আট বছর হবে শিশু দুটির। প্রত্যেকের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে।

যখন ফিরে আসছি, ইকবাল হলের বাইরে দেখা হলো প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারের সাথে—যিনি পরবর্তী সময়ে আল বদরের হাতে নিহত হলেন। তিনি তখন বিদেশি সাংবাদিকদের ঢাকার চিত্র বর্ণনা করছিলেন। আমাকে দেখে তার জিপ গাড়ি থামিয়ে বললেন, ‘তুমি এখানে কেন? শহরের অবস্থা এখন ভয়াবহ। এসময় বাইরে থাকতে নেই।’ কিন্তু সেদিন তার কথা আমি

মানতে পারি নি। ওখান থেকে চলে গেলাম শহীদ মিনার দেখতে। সেটাও ভেঙে ফেলা হয়েছে। বাংলা একাডেমি ও রমনার কালীবাড়িতে গেলাম। সর্বত্রই বিধ্বস্ত অবস্থা। বাড়ি ফিরলাম। বুঝলাম, এই হলো যুদ্ধের সূচনা।

নয় মাস যুদ্ধ চলল। ১৬ ডিসেম্বর আমাদের বাড়িতে এলেন আমার শিক্ষক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুল হালিম। তিনি যশোরের কালিগঞ্জের এক মায়ের ঘটনা বললেন।

সেই মা তার প্রতিবন্ধী ছেলেকে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে তুলে দেন, যাতে অন্য দুজন মুক্তিযোদ্ধা প্রাণে বাঁচে। সেনারা প্রতিবন্ধী ছেলটিকে উঠানে গুলি করে রেখে যায়। এ ঘটনা শোনার পর বেঁচে যাওয়া ঐ দুজন মুক্তিযোদ্ধা যখন কাঁদছিল তখন সেই মা তাদের ধাক্কা দিয়ে বলেছিলেন, ‘তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে যাও, আমি স্বাধীনতা চাই।’ এই ঘটনাটি নিয়েই আমি *হাঙর নদী* গ্রন্থে উপন্যাসটি লিখি। এর ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে।

পুরুষরা যখন যুদ্ধে গেছে, নারীরা তখন ঘর সামলেছেন। প্রবীণদের সেবায়ত্ত্ব করেছেন, শিশুদের রক্ষা করেছেন। নারীরা এসব না করলে আমরা নতুন প্রজন্মই পেতাম না। অনেক নারী রণাঙ্গনেও অস্ত্র হাতে নিয়েছেন। যেমন তারামন বিবি। তখন তার বয়স ১৩ কি ১৪। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে ভাত রান্না করতেন তিনি। নদীর ওপার থেকে গানবোটের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। তিনি দ্রুত নারকেল গাছের মাথায় উঠে গেলেন। সবাইকে সতর্ক করলেন—‘মিলিটারি আসছে!’ মুক্তিযোদ্ধারা যে যার মতো নিরাপদ স্থানে সরে পড়লেন।

একজন হাবিলদার তারামন বিবির এই সাহস ও বুদ্ধিমত্তা দেখে তাকে ট্রেনিং দিলেন। তারপর তারামন বিবি অস্ত্র হাতে নিলেন। যোগ দিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বিভিন্ন অপারেশনে।

আরেকজন মেয়ে—তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র রক্ষা করতেন। একবার হলো, গেরিলাদের খবর পেয়ে মিলিটারিরা ধামে চলে এসেছে। গেরিলারাও বুঝতে পেরে আড়ালে চলে গেলেন। এদিকে মেয়েটি তাদের বন্দুকগুলো পুকুরে ডুবিয়ে রাখলেন। মিলিটারিরা এসে জিজ্ঞেস করল, ওরা কোথায়? মেয়েটি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, ‘আমি তো জানি না’। মিলিটারির দল মেয়েটিকে গুলি করে চলে গেল।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নারী-পুরুষ কারো অবদান কম নয়। কিন্তু নারীদের স্বীকৃতি আমরা যথাযথভাবে দিতে পারি নি। যে নারীরা যুদ্ধে নির্যাতিত হয়েছে বা যুদ্ধশিশুর জন্ম দিয়েছে তাদের অনেককেই পরিবার থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। নতুন প্রজন্মকে তাই সত্যটা জানাতে হবে। সেটা হলো—নারী-পুরুষের সম্মিলিত শক্তিতেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

মুক্তিযুদ্ধের এই ঘটনাগুলো আমাদের শিল্প-সাহিত্যে আনতে হবে। কারণ শিল্পের কাজ হলো একটি সমাজব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে প্রকাশ করা। বিশ্ব দরবারে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনকে অনেকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের এখনো অনেক দূর যেতে হবে। সেই দূর যাত্রায় আমরা যেন পিছিয়ে না পড়ি। আগামী প্রজন্ম যেন গর্বের সাথে বলতে পারে—আমার ঐতিহ্য আমার স্বাধীনতা, আমার ঐতিহ্য আমার মাতৃভাষার মর্যাদা।

তাই মায়ের বলি, সন্তানদের সবসময় নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন, জাতিসত্তার ঐতিহ্যকে তুলে ধরবেন।

গুরুজীকে লেখা চিঠি

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আসসালামু আলাইকুম।

শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই আমি একজন ভালো শিক্ষার্থী হিসেবে পরিচিত। প্রথম সারির স্কুল ও কলেজে আমার পড়ার সুযোগ হয়েছে। এসএসসি ও এইচএসসি-তে ভালো ফলাফলসহ বৃত্তিও পেয়েছি। স্কুলে পড়ার সময়ই ডাক্তার হওয়ার লক্ষ্য স্থির করেছিলাম। সে অনুযায়ী ২০১৮ সালে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিই। কিন্তু কোনো সরকারি মেডিকেল কলেজেই আমি চান্স পেলাম না।

সেই সময় এত গভীর ও তীব্র কষ্ট আমার মনের মধ্যে কাজ করছিল, যা কখনোই আমি প্রকাশ করতে পারব না। চারপাশের পরিচিত মানুষদের নানা কথায় তখন আমার দম বন্ধ অবস্থা। হতাশা, বিষণ্ণতার মতো আত্মঘাতী আবেগগুলো আমার মধ্যে কাজ করছিল।

অন্যান্য মধ্যবিত্ত পরিবারের মতো আমার পরিবারও আমার এই অবস্থা দেখে পরিচিতদের কাছ থেকে ঋণ করে এবং ব্যাংক লোন নিয়ে প্রাইভেট মেডিকলে আমাকে পড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কারণ প্রাইভেট মেডিকলে ভর্তি হতে ১৮ লক্ষ টাকা এবং এমবিবিএস শেষ করতে ন্যূনতম ২৮ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

ঋণের এ ধরনের চাপ নিয়ে মেডিকলে পড়া আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। প্রতিমুহূর্তে এমন মানসিক চাপ নিয়ে একজন ডাক্তার হিসেবে আমার বিকাশ সম্ভব নয় এবং আমার পরিবারের জন্যেও তা ক্ষতিকর। তাই আমি দ্বিতীয় বার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে মনস্থির করলাম।

আবারো চারপাশের সবার নেতিবাচক কথা-দ্বিতীয় বার মেডিকেল পরীক্ষার্থীদের পাঁচ নম্বর কেটে রাখায় চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, এতে অনেক ঝুঁকি ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু কোয়ান্টাম মেথড কোর্স আমার মধ্যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল। আমার একটি বারের জন্যেও মনে হয় নি-আমি পারব না। পাঁচ নম্বর কেন, আরো বেশি নম্বরও যদি কেটে রাখে তবু আমি মেধাতালিকায় অবশ্যই চান্স পাব-এমন একটি চিন্তা আমার মধ্যে কাজ করতে লাগল।

আমি মনে করি, পড়ালেখার সাথে সাথে আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্নায়বিক চাপের মুহূর্তে নিজেকে শান্ত রাখা, মস্তিষ্কের পূর্ণ ব্যবহার ও আত্মপ্রত্যয়ী থাকাটা অনেক জরুরি। নইলে ভালো প্রস্তুতি নিয়েও পরীক্ষায় ভালো করা কঠিন হয়ে যায়।

মেডিটেশন চর্চা ছাড়া এগুলো অর্জন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। নিয়মিত মেডিটেশন আমাকে পরবর্তী একবছর আমার লক্ষ্যে অবিচল থাকতে সাহায্য করেছে। আমার একাগ্রতা বৃদ্ধি করেছে এবং আমি

দৈনিক দীর্ঘসময় পড়াশোনা করতে পেরেছি, যা অন্যদের রীতিমতো অবাক করত।

খুব ব্যস্ততার মধ্যেও আমি প্রতিটি সাদাকায়ন ও আলোকায়নে অংশগ্রহণ করতাম, যা আমার মধ্যে সবসময় ইতিবাচকতার অনুরণন তৈরি করত। এ-ছাড়াও মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দান, সদকা হিলিং ও নিয়ত করে একবার লামা কোয়ান্টায়নে অংশগ্রহণ করি।

যথাসময়ে আমি আমার পরীক্ষার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করি। ২০১৯-এ আমি আবার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দেই। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! সকল নেতিবাচকতা পেছনে ফেলে আমি মেধাতালিকায় সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকলে চান্স পাই।

গুরুজী, আপনার ও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রতি আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আপনার সন্তানতুল্য-
রাকিন হান্না আনান
৪০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আমার সালাম নিবেন।

আমার এক প্রতিবেশী ভদ্রমহিলা কাপড়ের ব্যবসা করেন। পাইকারি মার্কেট থেকে কাপড় কিনে এনে বাড়িতে বাড়িতে খুচরা বিক্রি করেন। ভালোই লাভ হচ্ছিল, এলাকায় বেশ সুনামও ছিল তার।

একসময় তিনি ব্যবসা বড় করতে চাইলেন। এর জন্যে প্রয়োজন আরো মূলধন ও লোকবল। তাই তিনি প্রথমে কিস্তিতে ঋণ নিলেন। একজন মহিলাকে নিয়োগ দিলেন, তাকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করতে হবে। লাভ দুই জনেরই হবে, এই ছিল চুক্তি।

একসময় সেই কর্মচারী মহিলা কাপড় বিক্রির সব টাকাপয়সা খরচ করে ফেলল। এদিকে কিস্তির লোকেরা নিয়মিত আসতে শুরু করল। এই কিস্তি শোধের জন্যে আমার প্রতিবেশী আরো একটি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিলেন। ধীরে ধীরে তিনি কিস্তির চক্রে ঢুকে গেলেন। একপর্যায়ে পরিচিতদের কাছ থেকেও সুদে টাকা নিতে লাগলেন। তার আয় নেই, কিন্তু ব্যয় আছে। কিছুদিনের মধ্যেই অনেক টাকা ঋণ হয়ে গেল তার।

যারা তাকে সুদে ঋণ দিয়েছিল, সেই পাওনাদাররা এসে একবার ঘরের ফ্রিজ থেকে কোরবানির মাংস পর্যন্ত নিয়ে যায়। ঘরের দৈনন্দিন বাজারও তারা উঠিয়ে নিয়ে যায় সুদ আদায় করতে না পেরে।

একবার তিনি স্বর্ণের অলংকার বন্ধক রেখে একজনের কাছ থেকে টাকা নিলেন। পরে জানা গেল, সেই ব্যক্তি ঐ স্বর্ণালংকার হারিয়ে ফেলেছে।

এখন তিনি যে বাড়িতে ভাড়া থাকেন সেখানেও পাওনাদাররা আসে। আজ না কাল, কাল না পরশু, এভাবে অনর্গল মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছেন আমার সেই প্রতিবেশী। এখন তিনি প্রায়ই বাবার বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে বলেন, তিনি আত্মহত্যা করবেন। আসলে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না ঋণের অভিশাপ এমনই ভয়াবহ।

নাম প্রকাশ করা হলো না

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আসসালামু আলাইকুম।

আমার এক আত্মীয়ের ঘটনা বলছি। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী। চাকরিরত অবস্থায় দেশের স্বনামধন্য একটি ব্যাংক তাকে পটিয়ে একটি ক্রেডিট কার্ড ধরিয়ে দেয়। ঐ ক্রেডিট কার্ড দিয়ে দুইবারে তিনি ৮০ হাজার টাকা উত্তোলন করেন তার একটি বিশেষ প্রয়োজনে।

এরপর সেই ব্যাংকের সাথে বহু বছর ধরে লেনদেন চলতে থাকে। একসময় তিনি মনে করেন, তাকে হয়তো আর টাকা ফেরত দিতে হবে না। কারণ ব্যাংকের পক্ষ থেকে কোনো তাগাদা নেই।

অনেক বছর পরে হঠাৎ করে ব্যাংক নোটিশ-তাকে ব্যাংকের ঋণশোধ করতে হবে। যে সময়ে তার কাছে এই খবর আসে তখন তার কাছে পরিশোধ করার মতো কোনো টাকা নেই।

ইতোমধ্যে তিনি আরেকটি ভুলের বৃত্তে জড়িয়ে গেছেন। অবসর গ্রহণের পর প্রতারকের মিষ্টি কথায় প্রভাবিত হয়ে পেনশনের সমস্ত টাকা তুলে দিয়েছেন তাদের হাতে। যে মানুষটি সারাজীবন চাকরি করেছেন, তিনি হঠাৎ করে ব্যবসায়ী হতে গিয়ে সবকিছু হারিয়ে নিঃশ্বাস হলেন। এ কঠিন সময়ে

ব্যাংকের নোটিশ এলো-তাকে ক্রেডিট কার্ডের টাকা শোধ করতে হবে।

প্রথমে তিনি বাসা বদলে ফেললেন এই ভেবে যে, ব্যাংক আর তাকে খুঁজে পাবে না। তাছাড়া শোধ করার মতো কোনো সামর্থ্য তার নেই। কিন্তু কয়েক বছর পর তিনি আইনি নোটিশ পেলেন। তার নামে মামলা হয়েছে।

ঋণের চিন্তায় এবং সবকিছু হারানোর ভয়ে একপর্যায়ে তার স্ট্রোক হলো। নিরুপায় হয়ে তাকে শোধ করতে হলো এক লক্ষ ৬০ হাজার টাকা প্রায়। স্ত্রীর জমি বিক্রি করে এবং আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতায় সেই টাকা শোধ করলেন।

এখানেই শেষ নয়। কিছুদিন পর আবার ওয়ারেন্ট এলো। জানা গেল ব্যাংকের করা এই মামলার সমস্ত খরচ তাকেই শোধ করতে হবে। অনেক কষ্টে এ অর্থ তিনি শোধ করলেন।

গুরুজী, এই হলো ক্রেডিট কার্ডের পরিণতি। তরুণ বয়সে প্রলুব্ধ করে ক্রেডিট কার্ড ধরিয়ে দেয় আর জীবনের শেষপ্রান্তে ভাগ্যে জোটে দুশ্চিন্তা, অপমান, স্ট্রোক, সীমাহীন দুর্ভোগ।

নাম প্রকাশ করা হলো না



সংগ্রহ করুন
কোয়ান্টাম প্রকাশিত
ঋণ সম্পর্কিত
স্টিকার। চারপাশে
সবার মাঝে
ছড়িয়ে দিন।
ঋণের অভিশাপ
থেকে নিজে বাঁচুন
এবং সচেতন
করুন অন্যকেও।

গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

সপরিবারে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসেছি

ডা. মোহা. আব্দুস সালাম



পরিবারের চার জন সদস্যসহ আমি এবার কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিলাম। প্রথমে আমি একাই করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভাবলাম, পরিবারের সদস্যদের নিয়েই আমার বসবাস। তাহলে একা কেন?

সবাই মিলে যখন একটি ভালো বিষয় জানব তখন এটা চর্চা করা আরো সহজ হবে। তা-ই হয়েছে। কোর্স শেষে যখন আমার সন্তানদের সাথে কথা বলেছি, দেখেছি তারাও ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি চর্চার প্রয়োজন অনুভব করছে।

চিকিৎসা পেশার পাশাপাশি আমি অধ্যাপনা করি। টানা দুটো ক্লাস নেয়ার পর প্রায়ই ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। কিন্তু এখন মেডিটেশন করে নিজেকে বেশ প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে। আশা করি, আমার ক্লান্তিটা আর থাকবে না।

এখানে বলা হয়েছে, শতকরা ৭৫ ভাগ অসুখই মন থেকে সৃষ্টি হয়। আমার পেশাজীবনেও দেখেছি, যেসব রোগী চিকিৎসকের কাছে আসেন তাদের অধিকাংশেরই সমস্যা আসলে মনোদৈহিক। এ কোর্স করলে রোগীদের তো উপকার হবেই, যে-কোনো পেশা-বয়সের মানুষও পাবে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

[সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, নিউরো-ট্রমা বিভাগ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতাল। ৪৬৪ ব্যাচ]

রাগ কমেছে, বেড়েছে সাহস

ফাতিমা শারমীন

আমার বড় বোন আমাকে প্রায়ই বলতেন, মেডিটেশন করো। শুনে আমি বিরক্ত হতাম। একপর্যায়ে মেডিটেশন শুরুও করলাম। দেখলাম আমার রাগ কিছুটা কমতে শুরু করেছে। কিন্তু পুরোপুরি যায় নি। আর এখন কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে আমার সবসময় রেগে যাওয়ার প্রবণতা আর নেই। আগে আমার হাত ঘামার সমস্যা ছিল, সেটিও কমতে শুরু করেছে।

এ-ছাড়া আগে আমি অনেক রি-একটিভ ছিলাম। এখন আমি একজন ইতিবাচক মানুষ। আর সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হলো, আমি সাহসী হয়েছি। আগে মনে হতো, চাকরি পেতে অন্যের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। মেডিটেশন শেখার পর এখন বিশ্বাস করি, আমার জীবন আমি নিজে গড়তে পারব। কারণ আমার মনছবি এখন সুস্পষ্ট।

[টপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্ন করেছেন। ৪৬৩ ব্যাচ]



সন্তান বড় হলে বলব- এই কোর্সটি করো

জেনিফার জাহান



কিছুদিন আগে আমার এক বান্ধবী বেড়াতে এলো বাসায়। তার সাথে অনেক গল্প করলাম। অনেক হাসলাম। সে চলে যাওয়ার পরে আমার ছয় বছর বয়সী মেয়েটি আমাকে বলছে, ‘মা তোমার বান্ধবীর সাথে তুমি এত হাসলে কিন্তু আমাদের সাথে তো শুধু রাগারাগিই করো! বান্ধবীর সাথে এই হাসিটা তাহলে তোমার অভিনয় ছিল, তাই না মা?’

মেয়ের প্রশ্ন শুনে মনটা খুব খারাপ হলো। আমার সন্তান মনে করছে আমি শুধুই রেগে থাকি। কিন্তু আমি তো এটা চাই না। এটা আমার মধ্যে এলো কীভাবে? ব্যস্ত জীবন, চাকরি, পারিবারিক চাপ-এগুলোর প্রভাব কি এতটাই যে, আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলছি?

এখানে যখন এলাম, প্রথমদিনই আলোচনা শুনে মনের অনেক নেতিবাচক চিন্তা চলে গেছে। মেডিটেশন করে অনেক প্রশান্ত অনুভব করছি। আমার সাথে আমার স্বামীও এসেছেন। কারণ স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলেই সংসার পরিচালনা করে। কোয়ান্টামের এই শিক্ষা তাই দুজনেরই জানা দরকার। আমার সন্তান যখন বড় হবে তাকে বলব, যাও কোর্সটি করো। আমি বিশ্বাস করি, সেও যখন কোয়ান্টামের ইতিবাচকতার শিক্ষা গ্রহণ করবে তখন আমার পরিবারটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে।

[সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৬২ ব্যাচ]

ফেসবুক ও সেলফি আসক্তি থেকে আমি এখন মুক্ত

রেহানা হাবিব



আমি ফেসবুকের প্রতি খুব আসক্ত ছিলাম। অনেক সেলফি তুলতাম। সেলফি তোলাটা একসময় নেশায় পরিণত হয়ে গেল। এমনও হয়েছে- ফেসবুকের লাইক কमेंট দেখতে গিয়ে সন্তানকে যে পড়াতে হবে, সেটাও ভুলে গেছি। আমার স্বামী প্রায়ই বলতেন, এই কোর্সটি করো। এবার আমি চলে এলাম।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে আমি সত্যটা বুঝতে পেরেছি। ভার্চুয়াল ভাইরাস আসলেই ভয়ংকর। অতীতে যা করেছি সেটা ভুল ছিল। এখানে এসে আমি সঠিক জীবনদৃষ্টি পেয়েছি। এজন্যে আমার স্বামীকে ধন্যবাদ জানাই।

[গৃহিণী। ৪৬৩ ব্যাচ]

ইনহেলারের চেয়ে দমচর্চা বেশি সুফল দিয়েছে

মো. জয়নাল আবেদীন

দুই বার আমার ফুসফুসের অপারেশন হয়েছে। তারপরও সুস্থ হই নি। শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিকমতো নিতে পারতাম না। হাঁটতেও কষ্ট হতো। এমন অবস্থা দাঁড়াল, একগ্লাস পানি নিজে খেতে পারতাম না। অন্য লোকের সাহায্য নিয়ে আমাকে চলতে হতো। দুবছর ধরে আমার এই অসুস্থতা।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে উপকার পেয়েছেন এমন একজনের অনুভূতি একদিন ইউটিউবে দেখলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম-আমিও কোর্সটি করব।

চার দিন মেডিটেশন ও দমচর্চা করে মনে হচ্ছে সুন্দরভাবে দম নিতে পারছি। বুকের ব্যথাও নেই। ইনহেলারের চেয়ে এই দমচর্চা আমার ক্ষেত্রে বেশি কাজ করেছে। ঠিকভাবে হাত নাড়াতে পারছি, আগে যেটা পারতাম না। এখন আমি অনেকখানিই সুস্থ।

[ব্যবসায়ী। ৪৬৩ ব্যাচ]

মেডিকেল কলেজে পড়ার মনছবি দেখতাম

ফারদিন রাইয়ান



আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিলাম এবছর নভেম্বরে। তাই বলে আমি কোয়ান্টামের নতুন সদস্য নই। সেই ছোটবেলা থেকে আমি মেডিটেশনের সাথে পরিচিত। আমার বাবা-মা ও ভাইকে দেখতাম মেডিটেশন

করতে। আর গুরুজীর বইগুলোও আমাদের বাসায় আছে। বইগুলো পড়ে আমি আত্মবিশ্বাস পেয়েছি। আমি জানি, মেডিটেশন হলো বিজ্ঞান।

আমি মনছবির কথা প্রথম শুনি বাবা-মায়ের কাছে। তারা আমাকে মনছবি মেডিটেশনের অডিও ট্র্যাক দেন। আমি এটি নিয়মিত চর্চা করতাম।

আমার বাড়ি ময়মনসিংহে। তাই মনছবি দেখতাম-আমি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করছি। এপ্রোন পরে রোগী দেখছি।

এদিকে নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে গেলাম। আর ভোরে উঠে নামাজের পর আমি মেডিটেশন করতাম। ভর্তি পরীক্ষার সময় এলো। আমি আল্লাহর রহমতে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজেই চাপ পেলাম। মনছবির শক্তি এত বেশি আগে জানতাম না।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে আমি আরো উপকার পেয়েছি। মোবাইলের প্রতি আমার এক ধরনের আসক্তি ছিল। কিন্তু এখানে এসে এই আসক্তি সম্পর্কে সচেতন হতে পেরেছি।

[শিক্ষার্থী, ১ম বর্ষ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ। ৪৬৪ ব্যাচ]

এই কোর্স তো মহাসমুদ্র!

মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন



আমি দেশের বাইরে বিভিন্ন আত্ম উন্নয়নমূলক কোর্স ও সেমিনারে অংশ নিয়েছি। তিব্বত, ভারত ও জাপানের প্রশিক্ষকের কাছে ইয়োগা শিখেছি। কিন্তু এই কোর্সগুলো একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নিয়ে

ডিজাইন করা হয়। আর ওসব কোর্সে অংশ নিতেও ব্যয় করতে হয় প্রচুর অর্থ।

কোয়ান্টাম মেথড সম্পর্কে আমার পরিচিতদের কাছে অনেক শুনেছি। তাই এবার দেশে এসে আমি এই কোর্সে অংশ নিলাম। এখন মনে হচ্ছে, অন্যান্য কোর্সের তুলনায় এটি মহাসমুদ্র!

যদি আরো আগে করতাম তাহলে আমি আরো সুস্থ থাকতাম, আরো স্ট্রেসমুক্ত থাকতাম। আমার একবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। আমার বিশ্বাস, মেডিটেশন চর্চা করলে সেটা হতো না। বহুবিধ উপকার পেয়েছি আমি এখানে এসে।

আমার বিশ্বাস, কোয়ান্টাম ব্যক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনেরই চেষ্টা করছে সফলভাবে।

[লন্ডন প্রবাসী অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার। ৪৬৪ ব্যাচ]

বাবাকে বলব-আমি তোমাদের দায়িত্ব নেব

শিমু আক্তার পপি



আমার বাবা একজন কৃষক। আমরা চার বোন। ভাই নেই। বাবা মাঝেমাঝেই বলতেন, ‘মেয়েরা তো জামাইয়ের ঘরে চলে যাবে। এদের অত পড়াশোনা করিয়ে কী লাভ?’ অর্থিক অবস্থাও আমাদের ভালো না।

ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছিলাম। বাবার ঋণ ছিল অনেক। তাই ১৩ বছর বয়সে আমাকে ঢাকায় একটা বাসায় কাজের জন্যে পাঠিয়ে দেয়।

ঢাকায় আমি যে বাসায় থাকতাম সেখানে কোয়ান্টামের স্টিকার দেখতাম-‘আমি পারি আমি করব আমার জীবন আমি গড়ব’। এটা আমি নিয়মিত পড়তাম। তারপর আমি সাদাকায়নে যাই। একটা একাউন্ট করি এ কোর্স করার জন্যে। তারপর ছয় মাস ধরে একটু একটু করে টাকা জমাই। এভাবেই আমার কোর্সে আসা।

আগে আমার অনেক হতাশা ছিল। মনে করতাম, আমি আর বড় মানুষ হতে পারব না। বাবা-মায়ের জন্যেও কিছু করতে পারব না। কারণ আমি মেয়ে। কিন্তু এখন বিশ্বাস করি, আমিও বড় হবো। লেখাপড়াও শিখতে পারব। আর বাবাকে বলতে চাই, ছেলে নেই তো কী হয়েছে? আমি তোমাদের দায়িত্ব নেব।

[গৃহকর্মী। ৪৬৪ ব্যাচ]

আবার হাসি ফিরে এসেছে আমার জীবনে

জামিলা আক্তার

গত ১০ বছর ধরে আমি রাতে ঘুমাতে পারি না। বহু ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করিয়েছি। অনেক ওষুধ খেয়েছি। কোনো উন্নতি হয় নি। আর দুই বছর আগে আমার একটা অপারেশন হয়েছিল। তারপর থেকে ঘাড়, হাত-পা ও হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা হতো। এমনকি আমি সিঁড়িতে ওঠা-নামা করতে পারতাম না।

এমন অবস্থা দেখে আমার স্বামী আমাকে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে নিয়ে এলেন। প্রথমদিন মেডিটেশন করার পর বাসায় ফিরে আমি কোর্সে শেখানো ঘুমানোর সহজ টেকনিকটি অনুসরণ করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল সকাল সাড়ে ছয়টায়। বাটপট বিছানা থেকে উঠলাম। অথচ আগে ঘুম ভাঙলেই চট করে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতাম না। ব্যথার কারণে ১০-১৫ মিনিট অপেক্ষা করতে হতো।

মেডিটেশন করে এখন আমার শরীরে কোনো ব্যথা নেই। সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামাও করছি। আমি হাসতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমার জীবনে আবার হাসি ফিরে এসেছে।

[গৃহিণী। ৪৬৩ ব্যাচ]

এখন আমি আর পণ্যদাস নই

মো. আশেক রাসুল রনি

আমার একজন বন্ধু দুবছর ধরে আমাকে এই কোর্সটি করতে বলছেন। বিভিন্ন কারণে আসা হয় নি। কোর্স করে মনে হচ্ছে, আমি কত নেতিবাচকতার মধ্যে ছিলাম! বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন-সবার সম্পর্কে এখন

ইতিবাচক ধারণা পোষণ করতে পারছি। অথচ আগে ওদের সম্পর্কে নেতিবাচকতা বোধ করতাম।

আমি ফেসবুক আসক্ত ছিলাম। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৮ ঘণ্টাই ফেসবুক চালু থাকত আমার ফোনে। আর দুই-তিন মাস পর পর মোবাইল সেট পরিবর্তন করতাম। এটাও ছিল এক ধরনের আসক্তি, যা এখন বুঝতে পারি।

আমি অপ্রয়োজনে প্রচুর পোশাক কিনতাম। আমার ভাইবোন দেশের বাইরে থাকেন। তাদেরকেও বলতাম পোশাক পাঠাতে। কোর্স করে আমি এখন সচেতন হয়েছি, এটা পণ্যদাসত্ব ছাড়া কিছুই না। দানের বরকত সম্পর্কেও জেনেছি। মনে হচ্ছে, এত অপচয় না করে এ অর্থ দান করলেই ভালো হতো। আমি কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক সাথে নিয়ে যাচ্ছি। এখন থেকে নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দান করব।

[বাবসায়ী। ৪৬৪ ব্যাচ]



মেডিটেশন করে আমার টেনশন কমে গেছে

মো. রুহুল আমিন



চার-পাঁচ মাস আগে ঘটনা। একদিন আমি হাঁটছিলাম। হঠাৎ আমার হাত-পা কেমন অবশ হয়ে যাচ্ছিল। ডাক্তারের কাছে গেলাম। ডাক্তার বললেন, আপনার তো হার্টের অনেক সমস্যা! এই বলে একমাসের

ওষুধ লিখে দিলেন।

আমি একমাস ঠিকমতো ওষুধ সেবন করার পর আবার ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে আরো ওষুধ দিলেন এবং এনজিওগ্রাম করানোর প্রস্ততি নিতে বললেন। একথা শুনে ভয় পেয়ে গেলাম।

পরিচিত একজনের কাছে জানলাম, টেনশন মুক্ত থাকলে হার্ট অনেক ভালো থাকে। আসলেই আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল, যে-কোনো বিষয় নিয়ে খুব টেনশন করতাম। তিনি আমাকে কোয়ান্টামে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। এবার সময় করে এ কোর্সে এলাম। মেডিটেশন করলাম।

আগে ১৫-২০ মিনিটও হাঁটতে পারতাম না। কোর্সের দ্বিতীয় দিনে নিরাময়ের মেডিটেশন সম্পর্কে জানলাম। ধ্যানের স্তরে নিরাময়ের প্রক্রিয়াটি অসাধারণ এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। এখন আমি টানা ৩০-৪০ মিনিট হাঁটতে পারছি। মেডিটেশন করে আমার টেনশনও কমে গেছে।

[উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা। ৪৬৩ ব্যাচ]

বুলিংয়ের ভয়ে জয় করেছি

ফাইজা আলম



গত তিন মাস ধরে আমি খুব ডিপ্রেসনে ছিলাম। সবসময় নিজেকে একা মনে হতো। এই তিন মাস আমি স্কুলেও যাই নি। দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতাম। খেতেও ইচ্ছে করত না। ঘুমও আসত না। শুধুই কাদতাম।

তিন মাস আগে আমি স্কুলে বুলিংয়ের শিকার হয়েছিলাম। প্রতিনিয়ত সেই ভয়টি আমার ভেতরে কাজ করত। মনে হতো, চারপাশের কেউ আমাকে পছন্দ করে না। অথচ আমি আগে এরকম ছিলাম না। বেশ প্রাণবন্ত ছিলাম।

এজন্যে আমার মা আমাকে বিশেষজ্ঞ কাউন্সিলর দেখিয়েছেন। কিন্তু আমার ভালো লাগত না। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে গুরুজীর কথাগুলো শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছি। মনে হচ্ছে, এবার আমি পারব। আমার আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে। সবার সাথে এখন আমি হাসিমুখে কথা বলতে পারছি। এখন আমার একটি মনছবিও আছে।

[শিক্ষার্থী, ষষ্ঠ শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। ৪৬৪ ব্যাচ]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন



উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : গুরুজী, আপনি আমাদেরকে দুঃখের গান শুনতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু দেশাত্মবোধক গানগুলো তো সাধারণত দুঃখের হয়। তাহলে আমরা কি আর দেশাত্মবোধক গান শুনব না? উত্তর দিলে উপকৃত হবো।

উত্তর : দুঃখের গান শুনতে যদিও অনেকেরই ভালো লাগে, কিন্তু এসব গান ক্রমাশয়ে মানুষকে বিষণ্ণ আর হতাশ করে তোলে। অন্যদিকে, দেশাত্মবোধক গান আমাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করে। একে মোটেও দুঃখের গান বলা যাবে না; বরং এসব গান আমাদের অনুপ্রাণিত করে, শক্তি দেয় এবং অন্তরে সমর্মিতার অনুভূতি সৃষ্টি করে।

প্রায় সব দেশাত্মবোধক গানের মূল কথাই হলো সেইসব আত্মত্যাগী বীরদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ ও তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, যারা দেশমাতৃকার সম্মান স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে অকাতরে প্রাণদান করেছেন, শহিদ হয়েছেন। সেইসাথে দেশ, মাটি ও মানুষের উচ্চতর এবং আলোকিত বৈশিষ্ট্যগুলোও প্রকাশিত হয় এসব গানের বাণী ও সুরে। যার ফলে এসব গান শোনার মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তর্গত শক্তি জাগ্রত হয়। ভেতর থেকে ভালো কিছু করার তাড়না অনুভব করি আমরা।

অতএব দেশাত্মবোধক গানের অনুভূতি মূলত ইতিবাচক অনুভূতি। তাই দেশাত্মবোধক গান শুনবেন, আমাদের বীর ও শহিদদের জন্যে দোয়া করবেন। তাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করবেন। তাহলেই আপনি তাদের জীবন থেকে প্রেরণা লাভ করবেন। সর্বোপরি উজ্জীবিত হবেন দেশপ্রেম, সমর্মিতা ও মানবপ্রেমে।

প্রশ্ন : ঘরে-বাইরে সবার জন্যেই এখন রয়েছে বিনোদনের নানা রকম সুযোগ ও ব্যবস্থা। আমার প্রশ্ন হলো, সঠিক জীবনদৃষ্টি অনুসারে জীবনে বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? থাকলে সঠিক ও সুস্থ বিনোদন কী হতে পারে?

উত্তর : প্রশ্নটা সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত জরুরি। কারণ ইন্টারনেট, ইউটিউব, ফেসবুক, টিভি সিরিয়াল আর স্মার্টফোন কিংবা স্মার্ট টিভির সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয়াকেই এখন বিনোদন মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। এগুলো কোনোভাবেই সুস্থ বিনোদন হতে পারে না।

কারণ মানুষে মানুষে বাস্তব যোগাযোগবিহীন এসব তথাকথিত বিনোদন আপনাকে কখনোই নতুন প্রাণশক্তি ও কর্মোদ্যমে উজ্জীবিত করে না; বরং আপনাকে অবসন্ন করে। আরো নিক্রিয় ও নিস্তেজ করে তোলে। অথচ সত্যিকার বিনোদন তো সেটাই, যা আপনার মধ্যে নতুন উদ্দীপনা জোগাবে এবং আপনি দ্বিগুণ উদ্যমে কাজে নেমে পড়বেন।

কিন্তু স্ক্রিনির্ভর এসব বিনোদনে কি তা হয়? কখনোই না। আমরা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে একথা বলছি। পৃথিবীজুড়ে মনোবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীরাও এখন তা-ই বলছেন-হতাশা, বিষণ্ণতা, উদ্যমহীনতা, মনোবৈকল্য ও কর্মবিমুখতার অন্যতম প্রধান কারণ এসব প্রযুক্তিপণ্যের আত্মাস।

কারণ বিনোদনের নামে এসব একদিকে জীবনের মূল্যবান সময় কেড়ে নিচ্ছে, অন্যদিকে গড়ে তুলছে আসক্ত, পরিশ্রমবিমুখ ও মেধাহীন একটি প্রজন্ম। যে-কারণে প্রযুক্তি মাফিয়ারা বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ ও শিশুদের হাতে স্মার্টফোনসহ নতুনতুন প্রযুক্তিপণ্য তুলে দিচ্ছে। কিন্তু তারা নিজেদের সম্ভাবনাদের কখনোই এসব উপকরণ হাতে নিতে দেয় না-সেটা বিনোদনের জন্যেই হোক বা যোগাযোগের প্রয়োজনেই হোক। কারণ এর পরিণতিটা তারা ভালোভাবেই জানে। অতএব নিজেরা বাঁচুন। সম্ভাবনাদের বাঁচান। সম্ভাবনাদেরকে পরিশ্রমনির্ভর জীবনযাপনে উৎসাহিত করুন।

আর সঠিক জীবনদৃষ্টির সাথে বিনোদনের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু সেটা হতে হবে সুস্থ বিনোদন। যেমন, চিরায়ত সাহিত্য ও আত্ম উন্নয়নমূলক বই পড়া, মানুষ ও প্রকৃতিকে জানতে ভ্রমণ, বাগান করা, খেলাধুলা, সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা ইত্যাদি। এমনকি বঞ্চিত-অসহায় মানুষের কল্যাণে প্রতিদিন নিয়ম করে কিছুটা সময় দেয়াটাও হতে পারে আপনার জন্যে নতুন অনুপ্রেরণার উৎস।

এককথায় যা আপনাকে আসক্ত করে, নেশাগ্রস্ত করে, বাস্তব যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন একা মানুষে পরিণত করে, জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে, মেধার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে এবং আপনার অর্থনৈশের কারণ হয় সেটা বিনোদন নয়। জুয়া যেমন কখনো বিনোদন হতে পারে না, মাদক কখনো বিনোদন হতে পারে না। যা আপনাকে স্বস্তি দেয়, প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত করে, সেটাই সত্যিকারের বিনোদন।

প্রশ্ন : চিনি বর্জনে সচেতনতা সৃষ্টির জন্যে কোয়ান্টামের পদক্ষেপ সত্যিই প্রশংসনীয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরাও চিনিকে চিহ্নিত করছেন 'হোয়াইট পয়জন' হিসেবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি চিনি বর্জন করতে। কিন্তু অতিথি আপ্যায়নে বা কারো বাসায় দাওয়াতে যাওয়ার সময় মিষ্টির প্রচলন সর্বত্র। এ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কী? মিষ্টির বিকল্প হিসেবে আমরা কী দিয়ে আপ্যায়ন করতে পারি?

উত্তর : ফল ও খেজুর দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করুন। কারো বাসায় দাওয়াতে গেলেও মিষ্টান্নের পরিবর্তে ফল ও খেজুর নিয়ে যান। সবদিক থেকে এটাই স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ।

আসলে একটা প্রচলিত ধারণা ও অভ্যাসচক্রের বাইরে এসে সমাজে নতুন কিছু প্রচলন ঘটানো একটু সময়সাপেক্ষ, কিন্তু অসম্ভব নয়। বরং কিছু মানুষ সং উদ্দেশ্যে সজ্ঞাবদ্ধভাবে লেগে থাকলে সমাজের সবাই একসময় সেটা সাদরে গ্রহণ করেন, এটাই সত্য। এর প্রমাণ তো অনেক আছে।

যেমন, আমরা কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা যখন ২০১৩ সাল থেকে বৈশাখে ইলিশ বর্জন করলাম, একটু একটু করে চারপাশে এর প্রভাব পড়তে শুরু করল। সর্বস্তরেই একটা সচেতনতা পরিলক্ষিত হলো। ফলে গত কয়েক বছরে বৈশাখে ইলিশ খাওয়া ও ইলিশ নিধনের ব্যাপারে অসাপু ব্যবসায়ীদের প্ররোচনায় ভাটা পড়ল। আর এটা তো এখন প্রমাণিত

সত্য যে, আমাদের দেশে ইলিশের আকার ও স্বাদ বেড়েছে, যেখানে অন্যান্য দেশের ইলিশের আকার কমে গেছে!

শুধু তা-ই নয়, দুই দশক ধরে আমরা প্রতি রমজানে শুধু খেজুর-পানি দিয়ে ইফতার করছি-এরপর বহু রকমের খেজুর দেশে সহজলভ্য হয়েছে, যা ২০ বছর আগে ছিল না। কারণ খেজুরের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। অথচ আমরা ছোটবেলায় দুধরনের খেজুরই শুধু দেখতাম-একেবারে চাপ্টা এক ধরনের খেজুর, আরেকটা ছিল শুকনো খোরমা।

আসলে যখন যেখানে যে জিনিসের চাহিদা সৃষ্টি হয়, সেখানে সেই জিনিসের প্রাচুর্য সৃষ্টি হয়। যেমন, ডাব। এখন প্রতিটি বাজারে তো আছেই, এ-ছাড়াও রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভ্যানগাড়িতে ডাব। এই চাহিদা যখন আরো বাড়বে এবং আমরা আরো ডাব গাছ রোপণ করব, দেখা যাবে তখন ডাব রপ্তানিও করা সম্ভব হচ্ছে। দুয়ুগের বেশি সময় ধরে আমরা কোয়ান্টামে বলে আসছি যে, কোমল পানীয় বর্জন করুন। এর পরিবর্তে ডাবের পানি পান করুন। একদিকে আপনার স্বাস্থ্য বাঁচবে, সেইসাথে টাকাটা পাবে দেশের কৃষক।

একইভাবে আমরা যদি খেজুরের চাহিদা সৃষ্টি করি এবং ব্যাপকভাবে ভালো মানের খেজুর উৎপাদন শুরু করি, তাহলে ভবিষ্যতে অন্যান্য দেশে আমরা খেজুর রপ্তানি করতে পারব ইনশাল্লাহ। আগামী ১৫ বছরে এই বাস্তবতা সৃষ্টি করা সম্ভব, যদি আমরা চাই। কারণ আমাদের আন্তরিক ও সজ্ঞাবদ্ধ চাওয়া যে কতটা কার্যকর, তা-তো আমরা জানিই। আর আমাদের মাটি এত উর্বর যে, এখানে বীজ পড়লে গাছ হয়ে যায় প্রায় কোনো যত্ন ছাড়াই।

দেশে বর্তমানে প্রতিবছর খেজুর আমদানি করা হয় ৩০ হাজার টন। এই ৩০ হাজার টন খেজুর উৎপন্ন হতে মাত্র আড়াই লক্ষ গাছই যথেষ্ট। আর ডাব এবং খেজুর গাছের জন্যে জায়গার প্রয়োজন হয় সবচেয়ে কম। জমির প্রাপ্ত ঘেষে রোপণ করলে মূল ক্ষেতের কোনো ক্ষতিও হয় না।

তাই বিসেসহ যে-কোনো দাওয়াতে, আপ্যায়নে ও সাফল্য উদযাপনে মিষ্টি বর্জন করুন। বিকল্প হিসেবে বেছে নিন খেজুর ও ফল, বিশেষত মৌসুমি ফল। আর খেজুর খাওয়া স্নান। রসুলুল্লাহ (স) খেজুর খুব পছন্দ করতেন। বহু দিন তাঁর কেটেছে শুধু খেজুর খেয়ে। তিনি খেজুরের বীজও ভিজিয়ে খেয়েছেন। পুষ্টির দিক থেকেও খেজুর খুব ভালো। অতএব এখন থেকে মিষ্টির বিকল্প হিসেবে আমরা খেজুরের প্রচলন করব। সেইসাথে দেশীয় ও মৌসুমি ফল তো আছেই।

এ মাসের অটোসাজেশন

জানাকে মানায় রূপান্তর করতে
না পারলে সে জানা অর্থহীন।

আমি জানব এবং মানব।

শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান রক্তদাতারা দেশের জন্যেই কাজ করছেন



১৫১ তম পর্বের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

বর্তমানে আমাদের দেশে স্বেচ্ছায় রক্তদানের সচেতনতা তৈরি হচ্ছে, যা ২০ বছর আগেও ছিল না। আর ৭০ কিংবা ৮০-র দশকে তো কল্পনাই করা যেত না। সাধারণ মানুষের মনে এক ধরনের ভীতি কাজ করত। ফলে মাদকাসক্ত বা পেশাদার রক্ত বিক্রেতাদের কাছ থেকে অনেক সময় রক্ত নিতে হতো। একবার ভাবুন, একজন সুস্থ মানুষের শরীরে দূষিত রক্ত গেলে কী অবস্থা হবে? রক্তদাতারা মুমূর্ষু মানুষের জীবন বাঁচানোর কাজ করছেন। ১৯৭১ সালে দেশমাতৃকার জন্যে যেমন মুক্তিযোদ্ধারা রক্ত দিয়েছিলেন, আপনারা মুক্তিযুদ্ধ না করলেও দেশের মানুষের জীবন বাঁচাতে এগিয়ে এসেছেন। আপনারা আসলে দেশের জন্যেই কাজ করছেন।

২৪ নভেম্বর শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা ১৫১ তম পর্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-এর (পিআইবি) মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ।

এর আগে ১৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননার ১৫০ তম পর্ব। প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফারুক আহমেদ। তিনি বলেন, ‘মানুষের জীবন হলো তার কাজের সমষ্টি। কিন্তু কাজটা হতে হবে ইতিবাচক। কারণ নেতিবাচক কাজ জীবনের সংজ্ঞা হতে পারে না। বলা হয়, ত্যাগের মাঝেই রয়েছে প্রকৃত সুখ। তাই দেয়ার আনন্দই পারে জীবনকে সুখী করতে। রক্তদাতারা সুখের এ সূত্র ভালোভাবেই বুঝেছেন।’

উল্লেখ্য, ঢাকার কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে অনুষ্ঠিত এই প্রোগ্রাম দুটিতে কোয়ান্টাম ল্যাবে ন্যূনতম তিন বার রক্তদান করেছেন এমন ১৭০ জনকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান।



১৫০ তম পর্বে প্রধান অতিথি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফারুক আহমেদ ও সভাপতি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমানের কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন একজন রক্তদাতা

মহাজাগতিক সফরে

কানিজ ফাতেমা রুমা



২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮০-১২ নভেম্বর ২০১৯

১২ নভেম্বর মহাজাগতিক সফরে যাত্রা করেন কোয়ান্টাম ল্যাবের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী কানিজ ফাতেমা রুমা (ইন্সলিগ্নািহি ... রাজিউন)।

সেদিন সকালে মিরপুরস্থ বাসা থেকে কর্মস্থল ল্যাবে আসার পথে শান্তিনগর মোড়ে এক মর্মস্পন্দ সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। খবর পাওয়ার সাথে সাথে মুমূর্ষু কানিজকে নিয়ে তার ল্যাব সহকর্মীরা দ্রুত চলে যান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে।

হাসপাতালের ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের চিকিৎসকদের অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও বাঁচানো সম্ভব হয় নি কানিজকে। কোয়ান্টাম ল্যাব কর্মীদের দ্রুত তৎপরতায় রক্ত ও অন্যান্য উপকরণের তৎক্ষণাৎ জোগান দেয়া সম্ভব হলেও ততক্ষণে কানিজ ফাতেমা রুমা চলে গেছেন সমস্ত চিকিৎসার উর্ধ্ব। বেলা একটার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কানিজ ফাতেমা ২০১১ থেকে ফাউন্ডেশনে কাজ করছেন। কিছুদিন আর্কাইভে দায়িত্ব পালনের পর ইনফরমেশন সেল, কেন্দ্রীয় দফতরের অভ্যর্থনা এবং সবশেষে ল্যাবে যোগ দেন ২০১৩-তে। তিনি ল্যাবের সংযোগায়ন টিমে কর্মরত ছিলেন।

২৮৪ ব্যাচে তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স সম্পন্ন করেন। রিয়েলাইজেশন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন ১৬ তম ব্যাচে।

হাসিখুশি সদালাপী সপ্রতিভ এ মানুষটি ছিলেন ফাউন্ডেশনের প্রিয়মুখ। সজ্জের প্রতি তার আন্তরিকতা ও লেগে থাকা তাকে করেছিল ব্যতিক্রমী একজন।

আমরা কানিজ ফাতেমা রুমার সামগ্রিক অবদান গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি এবং তার অনন্ত প্রশান্তি কামনা করছি।

ভার্চুয়াল ভাইরাস সচেতনতামূলক সেমিনার



সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন

১ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে অনুষ্ঠিত হয় ভার্চুয়াল ভাইরাস সচেতনতামূলক সেমিনার। নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে মিশনের নিজস্ব মিলনায়তনে আয়োজিত এ সেমিনারে অংশ নেন জাতিসংঘ বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন এবং মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি (প্রেস) নূর এলাহী মিনাসহ মিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

- ১ নভেম্বর রাজশাহীর বহুমুখী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে জেলা শিক্ষা অফিসের আয়োজনে বিভিন্ন উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের ১৬০ জন শিক্ষক ও প্রশিক্ষকবৃন্দ অংশ নেন।
- ৫ নভেম্বর দিনাজপুরে ক্রিসেন্ট কিন্ডারগার্টেন গার্লস হাই স্কুল ও সারদেশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে যথাক্রমে ২১০ জন এবং ৩৫৫ জন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অংশ নেন।
- ৭ ও ১৪ নভেম্বর ঢাকার ভিকারুননিসা নূন স্কুলের আজিমপুর শাখায় তিনটি সেশনে ৭০৮ জন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অংশ নেন।
- ৭ নভেম্বর ঢাকায় রায়হান স্কুল এন্ড কলেজে ১২৪ জন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছেন।
- ১২ নভেম্বর ঢাকায় হামদর্দ কলেজের হোস্টেলে ৭০ জন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অংশ নেন।
- ১২ নভেম্বর মাগুরা জেলার ভাবনহাটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫১০ জন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক অংশ নেন।

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু কাজই ছিল যার প্রেম

রাত ১১টা। এখনো বাড়ি ফেরেন নি জগদীশচন্দ্র বসু। নিজের গবেষণাগারে কাজ করছেন গভীর মনোযোগে। গবেষণাগার বলতে ২৪ বর্গফুটের ছোট্ট একটি ঘর। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের শৌচাগারের পাশে পরিত্যক্ত এই ঘরটি বরাদ্দ পেয়েছেন অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু। যদিও কলেজে গবেষণাগার রয়েছে, কিন্তু সেখানে তার প্রবেশের কোনো অনুমতি নেই। কারণ তিনি বাঙালি।

এটি উনিশ শতকের কথা। তখনো আমরা ব্রিটিশদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

নীতিতে অহিংস ৷ তবু মাথা নোয়াবার নয়

পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে জগদীশ বসু যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন, ব্রিটিশ শিক্ষকদের চেয়ে অর্ধেকেরও কম বেতন দেয়া হলো তাকে। তিনি তা নিতে রাজি হন নি। বলেছিলেন, ‘যেদিন আমি ন্যায্য বেতন পাব সেদিনই নেব, তার আগে নয়।’ এরপর কোনো বেতন ছাড়াই অধ্যাপনা করে গেলেন। দায়িত্বে আন্তরিকতার কোনো কমতি ছিল না।

তার গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তিনি নিজেই ডিজাইন করতেন। স্থানীয় মিস্ত্রিকে দিয়ে তা বানিয়ে নিতেন। এসব খরচও নিজেই বহন করতে হয়েছিল। বেতন বা অধিকার আদায়ের জন্যে কারো শরণাপন্ন হন নি, কখনো তর্ক-বিতর্কেও জড়ান নি।

তিন বছর এভাবেই চলল। এবার কলেজ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলো তাকে পূর্ণ মর্যাদায় ব্রিটিশ শিক্ষকদের সমান বেতন দিতে। উপরন্তু তিন বছরের বকেয়া বেতনও তারা পরিশোধ করল। এই অর্থ পেয়ে জগদীশচন্দ্র প্রথমেই তার বাবার ধার-দেনা শোধ করে বাবাকে নির্ভর করলেন।

এ তিন বছর জগদীশের অর্থকষ্ট কিন্তু কম হয় নি। পত্রিকায় কলাম লিখে তিনি সংসার চালিয়েছেন। তবুও অটল ছিলেন তার অহিংস নীতি এবং লক্ষ্যে।

বাবা-মায়ের শিক্ষা ছিল দেশপ্রেম

ব্রিটিশ সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবা ভগবানচন্দ্র বসু ও মা বামাসুন্দরী বসু তাকে উদারনৈতিক একটি পরিবেশ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সন্তানকে তারা শিশুকালে ইংরেজি মাধ্যমে না পড়িয়ে বাংলা মাধ্যমে পড়িয়েছেন। শৈশবের স্মৃতিচারণ করে জগদীশচন্দ্র লিখেছেন, ‘জীবনের এই প্রান্তে এসে আজ আমি বুঝে ফেলেছি, জীবনের সবচেয়ে তলতলে কাঁচা বয়সে কেন আমাকে বাংলা স্কুলে পাঠানো হয়েছিল। নিজের ভাষা শেখা, স্বদেশের সংস্কার ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হও। হৃদয়ঙ্গম করো, তুমি ওদেরই একজন। বিচ্ছিন্ন নও, শ্রেষ্ঠ নও।’

লন্ডনে কেমব্রিজে পড়াশোনা করতে গেলেও পড়া শেষ করে তিনি দেশে চলে আসেন। পরবর্তীতে গবেষক হিসেবে অনেকবার বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেয়েও তা নাকচ করেছেন অবলীলায়।

সাহস জুগিয়েছেন সহধর্মিণী অবলা বসু

জগদীশচন্দ্রের স্ত্রী অবলা বসুর মতো মেধাবী বাঙালি নারী সে যুগে কমই ছিল। ১৮৮১ সালে প্রবেশিকা পাশ করে মেডিকলে পড়ার জন্যে তিনি মাদ্রাজে যান। তিন

বছর পড়াশোনাও করেন। কিন্তু বিয়ের পর সেটা সম্পন্ন করা হয় নি।

তাদের ৫০ বছরের দাম্পত্য জীবন খুব সুখের ছিল। জগদীশচন্দ্র অকপটেই বলেছেন, ‘আমার স্ত্রীর স্নেহ সহযোগিতা না পেলে বিজ্ঞানের সাধনায় সফল হওয়া কঠিনই হতো। সম্ভবত আমার কোনো প্রচেষ্টাই আলোর মুখ দেখত না। মাঝপথে তা উল্টে পড়ত মুখ খুবড়ে। বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে আমি অবলার কাছে চিরঋণী।’

সভ্যতাকে উপহার দিলেন নতুন এক বিজ্ঞান

গবেষণা করতে গিয়ে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের সাথে তিনি মিল খুঁজে পেলেন আলোক তরঙ্গের। এর নাম দিলেন ‘অদৃশ্য আলোক’ এবং বললেন, ‘অদৃশ্য আলোক ইট-পাটকেল, ঘরবাড়ি ভেদ করিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়। সুতরাং ইহার সাহায্যে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে।’ জনসম্মুখে প্রমাণ করেও দেখালেন।

১৮৯৫ সাল। কলকাতার টাউন হল লোকারণ্য। ৭৫ মিটার দূরত্বে তালাবদ্ধ একটি ঘরে সিগন্যাল পাঠিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রিগার চেপে পিস্তলের আওয়াজ শুনতে পেল সবাই। অনেকে মনে করলেন এটি জাদু! সভ্যতা পেল তারবিহীন নতুন এক প্রযুক্তি।

এবছরই তিনি মাত্র পাঁচ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ আদান-প্রদানের একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন এবং এই জ্ঞান সবার জন্যে উন্মুক্ত করে দিলেন। পরের বছর ইতালীয় বিজ্ঞানী জি. মার্কনি ২৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ প্রেরণ করলেন। সারা বিশ্বে খবর ছড়িয়ে পড়ল, মার্কনি হলেন বেতার আবিষ্কারক। অথচ জগদীশ বসুর নাম কেউ নিলেন না। পরাধীন একটি দেশের নাগরিককে কে মূল্যায়ন করবে? চাপা পড়ে গেল তার নাম। কিন্তু তিনি থেমে থাকেন নি। চান নি কোনো স্বীকৃতি। এগিয়ে নিয়েছেন তার গবেষণা।

বর্তমানে সত্যটি কিন্তু সবাই জানে। মার্কনি নয়, জগদীশচন্দ্র বসুই রেডিও বিজ্ঞানের জনক।

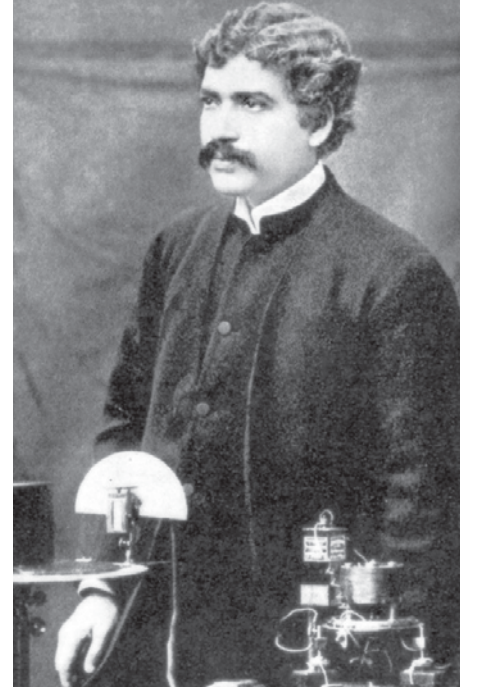
গাছেরও প্রাণ আছে, আছে অনুভূতি!

গাছের যে প্রাণ আছে—একথা তিনিই প্রথম বলেন। বিদ্যুৎ ও আলো নিয়ে গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে তিনি গাছ নিয়েও গবেষণা করেছেন প্রায় ৩৩ বছর। নিরলস গবেষণায় আবিষ্কার করেছেন শতাধিক যন্ত্র। এসব যন্ত্র দিয়ে তিনি পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন গাছের জীবনচক্র এবং গাছের অনুভূতির নানা রহস্য।

বিজ্ঞান সাধনার বিষয়, কোনো বিক্রয়পণ্য নয়

অনেকেই তার আবিষ্কারগুলোকে পেটেন্ট করতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন, একজন বিজ্ঞানী কখনো অর্থের পেছনে ছুটতে পারেন না। কারণ বিজ্ঞান বিক্রির পণ্য নয়। এটি সাধনার বিষয়।

আসলে কোনো মোহ সাধনার বিপরীতে তাকে নিয়ে যেতে পারে নি। সভ্যতাকে তিনি ঋণী করে গেছেন। তার নিরলস কর্ম-সাধনা আবাহন প্রমাণ করল—সত্যের জন্যে যে কাজ করে, তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি না পেলেও ইতিহাস তাকে মাথা নুইয়ে স্বীকৃতি দেয়।



৩০ নভেম্বর ১৮৫৮ – ২৩ নভেম্বর ১৯৩৭

‘যে ব্যক্তি পৌরুষ হারিয়েছে, কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে।’

‘বিজ্ঞান প্রাচ্যের বা পাশ্চাত্যের নয়, বিজ্ঞান সর্বজনীন’

- জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম ময়মনসিংহে এবং পিতৃভূমি মুন্সিগঞ্জে।
- বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তার সম্পর্কে বলেন, ‘জগদীশচন্দ্র যেসব অমূল্য তথ্য পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন সেগুলোর প্রতিটির জন্যে বিজয়জ্ঞপ্তি স্থাপন করা উচিত।’
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তার বন্ধু। তিনি বলেছেন, ‘মাটির প্রদীপ দেখা যায়, আলো দেখা যায় না। আমার বন্ধুর মাঝে আলো দেখেছিলাম।’
- বাংলা ভাষার প্রথম সায়েন্স ফিকশন লেখক।
- জগদীশচন্দ্র বসুর উদ্ভাবিত তারবিহীন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে রেডিও, টেলিভিশন, এমনকি একালের রাডারেও। আধুনিক ওয়াইফাই প্রযুক্তির উদ্ভাবনেও তার দেয়া তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
- আবিষ্কার করেন সেমিকন্ডাক্টর রেজিস্টার এবং এই উপমহাদেশে তার মাধ্যমেই প্রথম এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্সের চর্চা শুরু হয়।
- ১৯১৭ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’।
- মৃত্যুর আগে তার উপার্জনের ১৭ লক্ষ টাকার সম্পত্তির ১৩ লক্ষ টাকাই দান করেন বসু বিজ্ঞান মন্দির ফাউন্ডেশন। মৃত্যুর পর তার স্ত্রীও বাকি সম্পত্তি দান করেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।